নিহত হওয়ার আগে ও পরে

পিয়া সরকার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

বিখ্যাত নাট্যকার জে.বি. প্রিস্টলির 'অ্যান ইন্সপেক্টর কল'স' অবলম্বনে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থানা থেকে আসছি' নাটকের মুখবন্ধে উৎপল দত্ত এক আশ্চর্য কথা লিখেছিলেন।

তাঁকেই উদ্ধৃত করে লিখি, "এই নাটকে এক জটিল তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। অলাতচক্রের মত সময়ের গতি; কোনো এক সময়ে মশাল নিভিয়ে দিলেও সে অলাতচক্রের আভাস অন্ধকারের বুকে কিছুক্ষণ জেগেই থাকে।" থানা থেকে আসছি আরেকবার পড়তে পড়তে এক দুপুরে মাথায় এক চিন্তা এল। সময় পাল্টেছে, যুগ পাল্টেছে, বিবেকের ভূমিকায় তিনকড়ি হালদার বহুদিন মানুষের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় হানা দেন না। অপরাধের গতিপ্রকৃতিও পাল্টেছে বিস্তর। যারা একসময় আঙুল তুলত অন্ধকারের দিকে, তাদের নিজেদের আঙুলেও আজ নর্দমার কর্দম লেগেছে। তাহলে অলাতচক্রের কী পরিণতি হবে? কী হবে সেই অন্ধকারের যা আলো জ্বললেও জেগে থাকে গোপনে? অন্ধকারই কি চিরস্থায়ী হবে! কেমন হবে, যদি মানুষের বিবেকই অন্ধকারের চরিত্রে চূড়ান্ত ভূমিকাটি পালন করে? নিজের সৃষ্ট অতল অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে মানুষের মনে হবে, 'আমি! আমি কী সত্যিই এরকম!"

ভাবনা থেকে এই গল্প লেখা শুরু। পাঠকের সুচিন্তিত মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

ধন্যবাদান্তে
পিয়া সরকার
০৪. ০২.২০২১

নিরুদ্দেশের আগে

১৪-ই ডিসেম্বর, ২০০৮, কোলাঘাট।

দীপিকার বুকের ভিতর ধড়ফড় করছিল, মাথার দু’দিকের শিরা দপদপ করছিল অনেকক্ষণ ধরে। বাইরে প্রবল শীত আজ, অথচ শরীরের ভিতর অসহ্যকর উত্তাপ। এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। ইতস্তত করে পার্সের ভিতরটা হাতড়াল ও, ক’টা দোমড়ানো একশ’ টাকার নোট পড়ে আছে। দুপুরেই একপ্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেছে এই নিয়ে। আরও অনেক, অনেক টাকা প্রয়োজন।

হোটেলটাতে এর আগেও বহুবার এসেছে দীপিকা। রূপনারায়ণ নদীর ধার ঘেঁষা ছোট্ট রিসর্ট। আভিজাত্যে কুলীন নয়, কিন্তু প্রাইভেসি রক্ষাতে রাজকীয়। সাধারণত সোনার বাংলার মতো বড় হোটেলের কাস্টমারের জাতের থেকে আলাদা, একটু অন্য জাতের লোকজন ওঠে এখানে। তাদের আসা যাওয়া, সময় কাটানো সবই নিভৃতে। এসি রুম, অ্যাটাচড বাথ, সদ্য কাচা তোয়ালে, বাথরুমে রুম ফ্রেশনার, দুধ-সাদা বেডকভার মাঝারি মানের হলেও, আছে সবকিছুই। দীপিকাও এই পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, স্বচ্ছন্দও বলা যেতে পারে।

রুম নম্বর দুশ’-দুইয়ের বেলটা বাজাল ও। অন্যদিন ও নিজেই আগে আসে, আজ ব্যতিক্রম। টাকা না ছাড়লে সে আর একদিনও অপেক্ষা করবে না, উপরন্তু অন্য ব্যবস্থা নেবে - মনে মনে সাজানো কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল দীপিকা।

***

কোলাঘাট থানার এস.এইচ.ও জোয়ারদার সাহেবের এই সময়টা ইয়ারমার্কড। রাতে থানায় থাকলে, অন্তুর দোকান থেকে চা আসবেই আসবে। অন্তুর দোকানের ছেলেটা লোহার স্ট্যান্ডটায় চাপিয়ে স্পেশাল চা নিয়ে আসে। ছেলেটার বছর দশেক বয়স। চাইল্ড লেবার অ্যাক্ট দেখিয়ে অন্তুকে একবছর ঘানি ঘোরাবার ক্ষমতা রাখেন জোয়ারদার। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকালে একটু বাড়তি খাতির জোটে, সেটা না জানার মতো বোকা নন তিনি। ধোঁয়া ওঠা চায়ে চুমুক দিয়ে, অমলেটটাকে ছুরির তলায় ফালাফালা করতে করতেই বাইরে জিপের আওয়াজ পেলেন জোয়ারদার। শ্যামলাল এসে গেছে। এ.এস.আই ছেলেটি নতুন। একটু খ্যাপাটে, হতদন্ত হয়ে বিট জিপে কোলাঘাট চষে বেড়ায় প্রায়ই। উদ্ভট উদ্ভট কাজকর্ম করে মাঝে মাঝে। কোনোটাই কম্মের নয়। সেদিনই যেমন, অতুল মার্কেটের ছেলেটার এগেইনস্টে জোর করে একটা এফ.আই. আর করল। পরদিনই নাচতে নাচতে বেল পেয়ে গেল ছেলেটা। এভিডেন্স কী? না একটা পেন ড্রাইভ আর খান দুই সিডি! ফুঃ! বড় করে একটা শ্বাস ছাড়লেন জোয়ারদার। নতুন চাকরি, তাই শ্যামলালের চামড়ার তলায় এখনও অনেক চর্বি।

এ.এস.আই শ্যামলাল ঘরে ঢোকার আগেই থানার ফোনটা বেজে উঠল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফোনটা ধরলেন জোয়ারদার। ওপারের কথা শুনে কপালে দুটো ভাঁজ পড়ল। আড়চোখে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে দেখে নিলেন। সাড়ে আটটা বাজে। শ্যামলাল ঘরে ঢুকে স্যালুট করতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জোয়ারদার। সার্ভিস রিভলবার হোলস্টারে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, “কুড়ি-একুশ বছর বয়স, ফিমেল, স্ট্যাবড টু

ডেথ। হোটেল রিভার-শাইন। হাসপাতালে একটা ফোন করে দেখো ফরেনসিকের কেউ আছে নাকি এখনও। আর বিট্টুকে বলো বাড়ি না যেতে, গাড়ি আজ রাতভর লাগবে।”

দীপ্তর কথা

১৩-ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

সূর্য অস্ত যাওয়ার ঠিক আগে আগে বাড়িটা চোখে পড়ল। মন্দারমণি ছাড়িয়ে তাজপুরের দিকে এগিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। ইউক্যালিপটাস গাছে ঘেরা দোতলা বাড়ি, বেশ পুরোনোই হবে। জনবহুল সৈকত থেকে অনেক দূরে, একদম একলা একটেরে। একটু ভুল হল, একেবারে একলা নয়। মৃতপ্রায় দিনের আলোতে যেটুকু দেখা যায়, তাতে মনে হল সমুদ্র ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে আসছে বাড়িটার দিকে, যেন কোনও সাদা ঘোড়া তার রূপোলি কেশাগ্র বাতাসে উড়িয়ে দৌড়াচ্ছে উর্দ্ধশ্বাসে। সফেদ ফেনাগুলো পাঁচিলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে। এখন বোধহয় জোয়ার!

মেইন রোড থেকে নেমে মেঠো পথ ধরল গাড়িটা। এদিকে প্রকৃতি ন্যাড়া। শিয়ালকাঁটা, ফণীমনসা, লান্টানা ফুলের ঝাড় গজিয়েছে পথের ধারে। ধুলো উড়ে ধূসর হয়ে আছে পাতাগুলো। দক্ষ হাতে স্টিয়ারিংটাকে বাঁদিকে ঘোরাল রায়া। এখন বোধহয় শরীরটা ঠিকই আছে ওর। মাঝপথে ধাবায় যেখানে খেতে নামা হয়েছিল, সেখানে ওর শরীর খারাপ করায় কিছুটা পথ আমি গাড়ি চালিয়েছিলাম। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়, যেখানে খেতে বসেছিলাম সেখানে কাকে কোথা থেকে একটা মরা ইঁদুর মুখে করে এনে ফেলেছিল। কাকটা চোখের সামনেই সেটাকে ঠুকরে ঠুকরে নাড়িভুঁড়ি বার করে খাচ্ছিল। প্রথমে আমাদের কারুরই চোখে পড়েনি, যখন পড়ল তখন দৃশ্য দেখে অলরেডি রায়ার পেটের খাবার মুখে উঠে এসেছে। কোনমতে বমি চেপে একধারে উঠে গিয়ে নিজেকে সামলেছিল ও। কলেজে থাকতেও দেখেছি কাক দেখলে ঘেন্না পেত।

এখনও সেটা পাল্টায়নি।

রায়ার দিকে তাকালাম। হাতির দাঁতের মতো সাদা হাত দুটোয় চকচক করছে রূপালি বালা। কালো স্লিভলেস টপটা অদ্ভুত কনট্রাস্ট তৈরী করেছে। আয়ত চোখ, টিকালো নাক, ঈষৎ ভরাট ঠোঁট - রায়া এখনও আগের মতোই সুন্দরী আছে।

"এস.কে.ডি স্যার ক্লাসে একটা প্রশ্ন করতেন খুব, মনে আছে দীপ্ত?" পাশ থেকে ও বলল।

"কোনটা বল তো?"

"পৃথিবীতে কোন মৌলিক পদার্থের প্রাচুর্য সবথেকে বেশি?"

"হাইড্রোজেন?" হেসে বললাম।

"ঠিক। কিন্তু তাকেও টেক্কা দিতে পারে কে?"

মাথা নাড়িয়ে রায়ার দিকে তাকালাম। কিচ্ছু মনে পড়ছিল না।

স্টিয়ারিংটাকে ডান দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে রায়া মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করল। তারপর ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "মানুষের বোকামি। নেহাতই আহাম্মক না হলে এমন জায়গায় কেউ পুনর্মিলন উৎসব করে? রঞ্জনটা চিরকালই আগমার্কা স্টুপিড।"

মিনিট তিনেক পরে রায়ার নতুন বোলেরো মস্ত একটা লোহার গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে চওড়া ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইগনিশন থেকে চাবিটা খুলতেই গাড়ি তার গর্জন বন্ধ করল, আর জানালা নামাতেই একসঙ্গে দুটো জিনিস আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে এল; সমুদ্রের জোলো বাতাস আর একটানা শোঁ-শোঁ শব্দ।

***

রঞ্জন ঠক করে হুইস্কির গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। ওর লম্বা রোগাটে চেহারাটা বয়সের প্রভাবে একটু স্থূল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মুখচোখের শার্পনেস একটুও ভোঁতা হয়নি। বাদামী চুলগুলো একই রকমভাবে চশমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বারো বছর আগেও যেরকম পড়ত।

জায়গাটাও যতই চাষাড়ে হোক, রঞ্জন দিব্যি সাজিয়েছে। দামি কাটগ্লাসে সোনালি তরল, বাহারি ঝাড়বাতির হলুদ আলো, পিঠের পিছনে নরম কুশন দেওয়া গদি, খাবারদাবারের এলাহি ব্যবস্থা... নরম সুখে আমার লং জার্নি-পীড়িত ক্লান্ত শরীরটা আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছিল।

রঞ্জনের আদিবাড়ি তালসারির কাছে একটা গ্রামে, এই বাড়িটা নেহাতই অবসর যাপনের জন্য ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেলেছে। সত্যি কথা বলতে কী, রঞ্জন কুমার জানা'র রুচি যে এতটা মার্জিত হতে পারে, সে নিয়ে কোনও ধারণাই আমার ছিল না। কলেজে পড়ার সময় ওর গ্রামের বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম। তখনও সেখানে কাঠের আঁচে রান্না হয়, মাটির দেওয়ালে ঘুঁটে শোকায়। কালো কালো রোগা ছেলেমেয়েরা, শুকনো খড়ি ওঠা আদুল গায়ে মেঠো উঠোনে খেলে বেড়ায়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পেয়ে রঞ্জন জানা শুধু ওর বাড়ির মধ্যে নয়, গোটা গ্রামেই একটা উদাহরণ হয়ে উঠেছিল।

রঞ্জন বিদেশে চলে যাওয়ার পর, আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ তলানিতে ঠেকেছিল। ন'মাসে – ছ'মাসে একবার হাই হ্যালো, ব্যস। সেটা পাল্টালো, যখন মাস তিনেক আগে ও আমাদের

কলেজেই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে যোগ দিল। তারপর থেকে ফোনে বা মেসেঞ্জারে যোগাযোগ। গেট টুগেদারের পরিকল্পনাটাও ওর আর রায়ার। আমার জন্যই অনেকদিন ধরে ব্যাপারটা আটকে গিয়েছিল।

দেড় বছর আগে আমার একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রায় রান-ওভার হতে হতে বেঁচে গেছিলাম। ন্যাশানাল হাইওয়েতে অনেকক্ষণ বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। মোবাইল ভ্যান এসে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাইক চালাচ্ছিল আমার বন্ধু, তার পা দুটোই বাদ যায়। আর আমার অ্যামনেশিয়া ডেভেলপ করে। মেমোরি অনেকটাই বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ ট্রিটমেন্টের পর আস্তে আস্তে রিকভার করেছি। আমার জেঠু নামকরা ডাক্তার, নিজেই ট্রিটমেন্ট করেছিলেন। চার মাস আগে ফিট বলে সার্টিফাই করেছেন, আর তারপরেই রায়ার আবদারে আজ এখানে আসা।

রায়া এই ভর সন্ধেবেলা আবার স্নান করেছে। ভেজা চুল থেকে জল গড়িয়ে পিঠের কাছটা ভিজেছে। কলেজে বেশ রিজার্ভড থাকত ও, একমাত্র আমাদের গ্রুপটার সঙ্গেই স্বচ্ছন্দ ছিল। খুব কম কথা বলত রায়া, সেই স্বভাব অবশ্য বেশ বদলেছে দেখলাম এখন। তবে আপাত ঘনিষ্ঠতার আড়ালে ও নিজের চারিদিকে এখনও একটা পাঁচিল তুলে রাখে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পাঁচিলের উচ্চতা হয়ত কমেছে, কিন্তু ভেঙে যায়নি একেবারে।

সন্ধে নেমেছে অনেকক্ষণ। নিরিবিলি বাড়িটায় প্রাণী বলতে আপাতত আমরা তিনজন। একজন চাকর এসে রেঁধে বেড়ে দিয়ে দুপুরেই বিদায় নেয়। চিকেন পকোড়া, ফ্রেঞ্চফ্রাই, ফিশ কাটলেট দিয়ে সন্ধের খ্যাটনও দিব্যি হয়েছে। কিন্তু যার

আমন্ত্রণে আসা, তাকেই অন্যমনস্ক লাগছিল। আসার আগে ফোনে দু'-তিনবার কথা হয়েছে, তখনও রঞ্জনকে বেশ এক্সাইটেড লাগছিল। অথচ আজ, মদের গ্লাস হাতে কী যেন গভীর ভাবনা ভেবেই যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে।

আসার মধ্যে বাকি আছে সমীরণ, যদিও ওর আসাটা কনফার্মড ছিল না যতদূর জানি। আমাদের চার বন্ধুর গ্রুপে একমাত্র সমীরণের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল না একেবারেই। রায়ার সঙ্গে নিশ্চয়ই ছিল। ইনফ্যাক্ট, রায়া ছিল বলেই, সবার সঙ্গে সবার কানেকশনটা রয়ে গেছে। রাস্তায় ও বেশ কয়েকবার ওর অধ্যাপনার, ওর ভাঙা সংসারের গল্প শুনিয়েছে। রায়ার সদ্য ডিভোর্স হয়েছে। তবে তা নিয়ে ও যে খুব ডিপ্রেসড সেটা মনে হচ্ছিল না। বরং খোশমেজাজে নানা গল্প বলছিল। সে সব গল্প এতবছর পরে শুনতে অন্যরকম লাগে। মনে হয়, গ্রহান্তরের কোনও রায়াকে দেখছি। এতগুলো বছর সামনাসামনি দেখা না হলে যা হয় আর কি! অসুস্থতার সময়ে ও প্রচুর খোঁজ খবর নিয়েছে। আজও দীর্ঘপথ গাড়িতে আসার সময়, আমি কেন এখনও বিয়ে করিনি, তাই নিয়ে জানতে চেয়েছে বারবার। মৃদু হেসে এড়িয়ে গেছি।

আইস-বাকেটের বরফগুলোয় হলদে আলো পড়ে চকচক করছিল। রঞ্জনকে খুঁচিয়ে বললাম, "কী ব্যাপার রে, একদম চুপচাপ।"

রঞ্জন কিছু একটা ভাবছিল, আমার কথায় চমকে উঠে হাসল, বলল, "না, না কই! তুই বল! তুই তো নামজাদা লেখক এখন, ইন্ডিয়া'স মোস্ট সেলিব্রেটেড ক্রাইম থ্রিলার রাইটার! কে যেন দেখলাম সেদিন লিখেছে, দীপ্ত মুখোপাধ্যায় হল ইন্ডিয়ার আয়ান র‍্যাঙ্কিন।"

"আর আয়ান র‍্যাঙ্কিন! অ্যাক্সিডেন্টটার পর সব মাথায়